উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার ৩০ মাঘ ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ২৬৫ সংখ্যা

## অসম্ভবের সম্ভবে জল্পনা

২০১৯ সালে লোকসভার নির্বাচন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন নরেন্দ্র মোদির এনডিএ সরকার তার সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছে। বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের পরই সরকার এবং বিরোধী পক্ষের দলগুলি নির্বাচনি যুদ্ধের মহড়া শুরু করবে। একদিকে সংসদের অধিবেশন কক্ষে, অন্যদিকে গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন তার পাঁয়তারা চলছে। আশা করা যায়, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের সমাসন্ন ভোট এবং আগামী এপ্রিল-মে নাগাদ কর্ণাটকের ভোটের ফলাফল লোকসভা ভোটযুদ্ধের পাঁয়তারা ও মহড়াকে মাত্রাতিরিক্ত ইন্ধন জোগাবে। এই নির্বাচনি আবহে একটি অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার জল্পনাও গতি পাচ্ছে। সেটা হল বিধানসভা সমূহ এবং লোকসভার ভোট একযোগে সম্পন্ন করা। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশ্বস্ত সহযোগী অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি একটি দৃশ্যমাধ্যম সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, সরকার অবশ্যই একত্রিত নির্বাচন চায় কিন্তু লোকসভার ভোট এগিয়ে আনার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে বিজেপির অন্দরমহলের একটি সূত্রের উল্লেখ করে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে, ৭২তম স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার ভাষণে আগাম ভোটের কথা বলতে পারেন। নরেন্দ্র মোদির স্বাধীনতা দিবসের আগামী ভাষণ সম্পর্কে এখন মন্তব্য করা অর্থহীন। তবে জেটলি যা বলেছেন সেই সূত্রে একযোগে লোকসভা ও বিধানসভার ভোট করার সরকারি অভিপ্রায় নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে। আগাম লোকসভা ভোটের প্রসঙ্গটি সরকারের আশু রণকৌশলের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু একত্রিত ভোটের অভিপ্রায়ের বিষয়টি, দেশের আইনসভাগুলির সর্বস্তরের ক্ষেত্রেই একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় নীতিগত অবস্থানের প্রশ্ন। একমাত্র সরকারি অভিপ্রায়ে এটা করার চেষ্টা হলে সেটা হবে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আকাশকুসুম কল্পনা। সরকারের অন্দরে একত্রিত নির্বাচনের কথা উঠছে নরেন্দ্র মোদির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের পর থেকে। এই বিষয়টি সংঘ পরিবারের একধর্ম, একজাতি, এক শাসন ইত্যাদি সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় ভাবনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু ভারতের মতো ফেডারেশনের চরিত্রের দেশে সার্বভৌম কেন্দ্রীয় শাসন অসম্ভব। এই কারণেই সংবিধান প্রণেতাগণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিছু ক্ষমতা রয়েছে যুগ্ম তালিকায়। কাজেই লোকসভার নির্বাচনের সঙ্গে একযোগে বিধানসভাগুলির ভোট করালেও নরেন্দ্র মোদি রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রের বশংবদ করতে পারবেন না। এটা করা তখনই সম্ভব যখন রাজনৈতিকভাবে দেশের সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধীদের প্রায় সম্পূর্ণ নিকেশ করা যাবে। একইসঙ্গে রাষ্ট্র কাঠামো ও তার পরিচালনা সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সংশোধন করতে হবে। এই দুটি কাজ সম্পন্ন করলে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অবশ্যই স্বৈরতন্ত্রে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু এই অভিপ্রায় বাস্তব করে তোলা অসম্ভব। কেন অসম্ভব তার বিস্তৃত উল্লেখ না করেও ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলীর একটি বিশেষ ঝোঁকের কথা বলা যেতে পারে। এটা হল, অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচকরা কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দলকে বেছে নেয়। এছাড়া আইনসভাগুলির সদস্যদের দলত্যাগ, দলবদল, জোট বদল ইত্যাদির ফলে সরকার, সংসদ ও বিধানসভাগুলির মেয়াদের হেরফের ঘটে। একইসঙ্গে সংসদ এবং বিধানসভার ভোট করতে হলে একবার যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকার, সংখ্যালঘু হয়ে পড়লেও, তাকে পূর্ণমেয়াদ পর্যন্ত কাজের ক্ষমতা দিতে হবে। এটা করলে প্রভুপদ ভজনা অর্থাৎ ক্ষমতাধরের কাছে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে বিধায়ক ও সাংসদদের দাসানুদাসে পরিণত করবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। রাজ্য সরকার হয়ে পড়বে কেন্দ্রীয় সরকারের পোষিত শাসনযন্ত্র। এটাই কি বর্তমান সরকারের অভিপ্রায়? লোকসভা ও বিধানসভাগুলির একত্রিত ভোট করা নিয়ে ২০১৫ সাল থেকেই আইন কমিশন, লোকসভার সংশ্লিষ্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং নীতিআয়োগে একদফা কথাবার্তা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনও বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু আপাতত এমন বিধিব্যবস্থা চালু করার কোনো সুযোগ ও সময় নেই। কেন না প্রয়োজন মতৈক্যের, যা অসম্ভব। তবুও এই জল্পনা কেন জিইয়ে রাখা হচ্ছে তা বোঝা কঠিন নয়। মোদি হাওয়ার দম ফুরিয়ে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ইতিউতি। কর্ণাটক এবং তার আগে অন্য তিন রাজ্যে বিজেপি জিতলে বরং গোটা কয়েক রাজ্যের ভোট একত্রে করার জন্য লোকসভা ভোট এগিয়ে এনে একটা পরীক্ষায় যেতে পারেন নরেন্দ্র মোদি। তারপর সসম্মানে উত্তীর্ণ হলে না হয়, তিনি সর্বময় ক্ষমতা হস্তগত করার কৌশল ভাববেন। সেটাও কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করার ভাবনার মতো হয়ে যেতে পারে। কারণ, ভারতে আন্দোলনের মাঠ খুব চওড়া। স্বাধীনতা অর্জনের দম ফুরিয়ে যায়নি এখনও।

## অমৃতধারা

দাম্ভিকতা, দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে বল : এগুলি তোমার সাজে না, এগুলি তোমার সাজে না। কোনো স্বামী কখনও তাহার স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া ভালোবাসে নাই বা স্ত্রীও তাহার স্বামীকে স্বামী বলিয়া ভালোবাসে নাই। স্ত্রীর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকেই স্বামী ভালোবাসে এবং স্বামীর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকেই স্ত্রী ভালোবাসে। প্রত্যেকের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তিনিই আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার প্রেরণা জাগান। ঈশ্বরই একমাত্র প্রেমস্বরূপ। প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বর, পরমাত্মা আছেন। অন্য সব কিছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া। আধ্যাত্মিক জীবনে যদি আনন্দ না পাই, তবে কি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মধ্যে তৃপ্তির সন্ধান করিতে হইবে ? অমৃত না পাইলে কি নর্দমার জল পান করিতে হইবে ? চাতক কেবল বৃষ্টির জল পান করে, উড়িতে উড়িতে সে শুধু ভাবে-ফটিক জল, ফটিক জল। কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝাও তাহার পাখার গতি থামাইতে পারে না বা জল পানের জন্য তাহাকে ধরাপৃষ্ঠে নামাইতে পারে না। ঈশ্বর-উপলব্ধির সহায়ক যে কোনো সম্প্রদায়কেই স্বাগত জানাও। ঈশ্বরানুভূতিই ধর্ম। নাস্তিক দয়াবান হইতে পারে কিন্তু ধার্মিক হইতে পারে না। পরন্তু ধার্মিককে দয়াশীল হইতেই হইবে। পশুত্ব, মনুষত্ব এবং ঈশ্বরত্ব-এই তিনের সমষ্টিতেই মানুষ। গরম বরফ, অন্ধকার আলো-বলিতে যাহা বোঝায়, সামাজিক উন্নতি বলিতে অনেকটা তাহাই বোঝায়। শেষ পর্যন্ত 'সামাজিক উন্নতি' বলিতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাহিরের কিছুর উন্নতি হয় না, জগতের উন্নতি করিতে গিয়া আমরাই উন্নত হই। আমি যেন মানুষের সেবা করিতে পারি-ইহাই আমার একমাত্র কাম্য।

**-স্বামী বিবেকানন্দ**

## শব্দরঙ্গ ■ ১৯২১

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ৫ | | | | | |
| ৬ | | | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ৭ | | ৮ |
| ৯ | | ১০ | | ১১ | | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১২ | | | ★ | ১৩ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। আপশোশ, অনুতাপ বা অনুশোচনা ৩। সমাধান বা মীমাংসা ৫। রাজা বা জমিদার বাড়ির ভেতরের ঘর ৬। শিষ্টাচার বা আদব কায়দা ৭। পদবি রায়, নামকরা ভাস্কর ৯। অবাস্তব কল্পনা ১২। শক্তপোক্ত নয় ভঙ্গুর ১৩। চোখের ভুল।

**উপর-নীচ :** ১। চেনাজানা বা যার নাম ঠিকানা এবং পরিচয় জানা আছে ২। চোখে লাগা / মনঃপুত হওয়া ৩। যেখানে খুব সহজেই যাওয়া যায় ৪। আদেশ পালন বা নির্ধারিত কাজ শেষ করা ৫। মদনদেবের অপর নাম ৭। দিন ও রাত মিলে আট ভাগের এক ভাগ সময় ৮। আকাশে তারাদের আপন দেশ ৯। গান শুরুর আগে তবলার সঙ্গে শিল্পীর রাগিনীর বিন্যাস ১০। কাঠি বা শলা ১১। যার চেহারা খুব সুন্দর।

### সমাধান ■ ১৯২০

**পাশাপাশি :** ১। হতশ্রী ৪। ঘড়াঞ্চি ৫। বিবি ৭। মন্থর ৮। ষড়ানন ৯। করকচ ১১। ফচকে ১৩। রপ্ত ১৪। ময়রা ১৫। সদর।

**উপর-নীচ :** ১। হজম ২। শ্রীঘর ৩। খুঞ্চি পোষ ৬। বিহান ৯। কদর ১০। চকমকি ১১। ফরাস ১২। কেয়ুর।

# সামাজিক নৈরাজ্যে নীরব সুশীল সমাজ

রাজনৈতিক আধিপত্য সামাজিক ক্ষেত্রকে গ্রাস করে। সামাজিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা স্তিমিত হয় রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রভাবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রের চারপাশেই দেখা যায় দুষ্কৃতীদের জমায়েত, লিখেছেন ড. রহিত বসু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে কয়েকটি ক্যাম্পাস রয়েছে, তার মধ্যে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজকে একটু এগিয়ে রাখা হয়। এই ক্যাম্পাসের সঙ্গে যেহেতু সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নাম জড়িয়ে রয়েছে, তাই রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজকে অন্য ক্যাম্পাসের তুলনায় এগিয়ে রাখা হয়, এমনটা নয়। এখনও এখানে যারা পড়াশোনা করতে আসে তাদের বেশিরভাগই মেধা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বিচারে কিছুটা এগিয়ে। এই ক্যাম্পাসে হয়তো পরিকাঠামো নিয়ে সমস্যা আছে। প্লেসমেন্ট নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে বি-টেক পড়া উচিত, নাকি বি-টেক পড়ার আগে তিন বছরের বিএসসি অনার্স পাস করে আসা উচিত, তা নিয়ে হয়তো তাত্ত্বিক বিতর্ক আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে হয়তো অনেকেই এখনও প্রাচীন ধারণা আঁকড়ে রয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের মেধা ও যোগ্যতা অস্বীকার করা যাবে না।

সেই রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে যখন ছাত্রের হাতে অধ্যাপককে চড় খেতে হয়, তখন বুঝতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুতর সংকট উপস্থিত হয়েছে। শিক্ষকরা যে সবাই ধোয়া তুলসীপাতা, এমন নয়। অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা মেধার তুলনায় ব্যক্তিগত আনুগত্য পছন্দ করেন। যাঁরা রাজনৈতিক আনুগত্যের বিচারে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই পড়ানো ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা না করে অনেক শিক্ষক এখনও হলুদ হয়ে যাওয়া বিবর্ণ কাগজে লেখা নোট ব্যবহার করেন। এতসব অভিযোগ সত্ত্বেও অবশ্য কোনো ছাত্রের শিক্ষককে চড় মারার অধিকার জন্মে যায় না।

এই সব ঘটনা সাধারণ মানুষকে এখন আর বিস্মিত করে না। আমিও এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি না। সামগ্রিকভাবে এই ধরনের সব ঘটনাকেই সমাজের উপর দলতন্ত্র কায়েমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলেই আমার মনে হয়, যে প্রভাব আমাকে এবং আপনাকে যে কোনো প্রয়োজনে শাসকদলের অফিসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রভাব অনেক গভীর। তার জেরে শ্লীলতাহানি করার অধিকার জন্মায় এবং পার পাওয়া যায়। তার জেরে বেশি রাতে ফাঁকা রাস্তায় কোনো তরুণীকে বিপন্ন করে তোলা যায় এবং পার পাওয়া যায়। কারণ আমাদের এখানে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক দলের অফিস থেকে, দুষ্কৃতীদের আনুগত্য থাকে শাসকদলের প্রতি। দলীয় আনুগত্যই এখন মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে দেয়।

আর এখানেই আসে নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজের ভূমিকার কথা। ফার্গুসন, স্মিথ অথবা মার্কস, আপনি যার কথাই ধরুন না কেন, নাগরিক সমাজকে তাঁরা দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এক, সুশীল সমাজ হল রাষ্ট্র এবং বাজারের মধ্যকার পাঁচিল এবং দুই, সুশীল সমাজ হল আমাদের সমাজের এমন একটি অংশ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের আঁচ যাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমাদের এখানকার সুশীল সমাজের সঙ্গে আপনি যদি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি মেলাতে চান, তাহলে ভুল হবে। ইতিহাসে প্রমাণ আছে, যে সুশীল সমাজ ৩৪ বছরের কমিউনিস্ট শাসনের 'জগদ্দল পাথর' সরানোর নামে পথে নেমে ইতিহাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই হয় এখন রাষ্ট্রের শরিক হয়ে গিয়েছেন, নতুবা চুইয়ে পড়া ক্ষমতা বা সুবিধা ভোগ করার জন্য রাষ্ট্রের তাঁবেদারি করছেন। যাঁরা ৩৪ বছরের বাম শাসনের পতনের সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আবার সুবিধাভোগীর তালিকা থেকে বাদ পড়ার পর মোহমুক্তি ঘটেছে।

সুশীল সমাজ সম্পর্কে মার্কসের ব্যাখ্যার সঙ্গে এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কাজের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কস মনে করতেন, রাষ্ট্র এবং বাজারের মধ্যে সুশীল সমাজ নামক পাঁচিলটি দৃশ্যমান হলেও আসলে জনগণের হাত থেকে বুর্জোয়াদের সম্পদ রক্ষার জন্য সুশীল সমাজকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মার্কসের ধারণা ছিল, সর্বহারার বিপ্লব শুধু রাষ্ট্রকেই নিশ্চিহ্ন করবে না, একইভাবে নিশ্চিহ্ন হবে সুশীল সমাজের ভূমিকাও। রাষ্ট্র এবং সুশীল সমাজের ভূমিকার পাশাপাশি ব্যক্তিগত সম্পদ এবং বাজারের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। মার্কসের এই মত ব্যক্তিগতভাবে আমি সমর্থন করি কিনা, তা নিয়ে পরেও আলোচনা চলতে পারে। যেমন বিতর্ক হতে পারে মার্কসের এই ধারণা চিনের ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য হয়েছে, তা নিয়েও।

> সমাজের উপর দলতন্ত্র কায়েমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার প্রভাব অনেক গভীর। তার জেরে শ্লীলতাহানি করার অধিকার জন্মায়, তার জেরে বেশি রাতে ফাঁকা রাস্তায় কোনো তরুণীকে বিপন্ন করে তোলা যায়। কারণ এখানে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনৈতিক দলের অফিস থেকে।

কিন্তু আপাতত আমাদের লক্ষ্য প্রধানত আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের ভূমিকা, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সুশীল সমাজের সম্পর্ক এবং জনগণের কাছে সুশীল সমাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা। আমাদের এখানে সাধারণত সুশীল সমাজের অংশ বলতে তাঁদের কথাই বলা হয়, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁদের নামডাক আছে, যাঁরা টেলিভিশনে সন্ধ্যার আড্ডায় দৃশ্যমান হন এবং মাঝেমাঝে কোনো কোনো ইশ্যুতে পথে নেমে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করেন। আমাদের এখানে সুশীল সমাজের আন্দোলন কোনো ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নয়। কোনো রাজনৈতিক দলও নিজেদের সাংগঠনিক ঘেরাটোপের বাইরে এসে নিজেদের পতাকা ছেড়ে সুশীল সমাজের আন্দোলনের শরিক হওয়ার চেষ্টা করেনি। তাদের অবশ্য এটা করার দরকারও পড়েনি, কারণ তার আগেই সুশীল সমাজের বড়ো অংশ নতজানু হয়েছে।

রাজনৈতিক আধিপত্য যে সামাজিক ক্ষেত্রকে গ্রাস করে, আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসেও তার প্রমাণ আছে। সামাজিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা স্তিমিত হয়েছে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রভাবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রের চারপাশেই দুষ্কৃতীদের জমায়েত। ক্ষমতা দখলের সময় তাদের ব্যবহার করা হয়, ক্ষমতা দখলের পর তারাই নেতাদের ব্যবহার করে। অতএব এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমাজে নৈরাজ্য কায়েম হয়।

অতএব আপনি যখন শিক্ষককে মার খেতে দেখেন, রাস্তাঘাটে নারীকে বিপন্ন হতে দেখেন, তখন আপনি বুঝবেন এই সব ঘটনা একটি সামাজিক প্রক্রিয়ার নিয়ম মেনেই হচ্ছে। যখন আপনি দেখেন সুশীল সমাজের একাংশ ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তখন আপনি নিশ্চিত বুঝবেন তাঁর নতজানু হওয়ার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে, তিনি সুবিধাভোগীদের তালিকায় নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পেরেছেন। অতএব আমাদের এখানে সমাজে রাজনৈতিক দলের আধিপত্য কায়েম এবং সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজেরও পরোক্ষ ভূমিকা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং, যে সুশীল সমাজ রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক দলের কাছে নতজানু, তাঁর কাছে আপনি প্রতিবাদী ভূমিকা আশা করতে পারেন না।

## জনমত

### বনমন্ত্রী দৃষ্টি দিন

ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম পশ্চিম শালকুমার। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও এটি এক অজপাড়া গ্রাম। বিদ্যুতের ব্যবস্থা হলেও রাস্তাঘাটের কোনো উন্নয়ন হয়নি। এই গ্রামের জনগণের প্রতি সরকার অনেকটা ভরসা করে বনসুরক্ষার জন্য। এই গ্রামের পাশেই খয়ের বাড়ি বনাঞ্চল। বনে প্রচুর দামি গাছ আছে, যা সরকারের মূল্যবান সম্পদ। বিট ও রেঞ্জ অফিস অনেক দূরে। বনাঞ্চলটি রক্ষণাবেক্ষণ করে ইডিসি কমিটি। কমিটির সদস্যরা এই গ্রামের বাসিন্দা। বন ধ্বংস রোধে কাজ করেন এনারাই। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি রাস্তা। পিডব্লিউডি রাস্তা থেকে বনাঞ্চলে যাওয়ার ও মৌজায় পৌঁছানোর কাঁচা রাস্তাটি বাম আমলে তৈরি। প্রবেশের মুখেই একটি নদী (হলং) আছে, সেখানে একটি কালভার্ট রয়েছে যেটা প্রতিবছর বন্যায় ভেঙে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এখনও ভাঙা অবস্থায় তা পড়ে আছে। সেখানে প্রয়োজন একটি মজবুত ব্রিজের। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ এদিকে কারও নজর নেই। বনরক্ষা ও সকলের স্বার্থে অবিলম্বে হলং নদীর উপর কালভার্টের পরিবর্তে একটি মজবুত ব্রিজ নির্মাণ করে বনরক্ষা ও জনগণের স্বার্থরক্ষা করতে বনমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**বিজয় রায়**
**বাদাইটারি, খালপাড়া, আলিপুরদুয়ার।**

### চোপড়ার দলুয়ামেলা

গত ৩১ জানুয়ারি 'ঐতিহ্যবাহী দলুয়ামেলা আজ শুরু' শীর্ষক প্রতিবেদন পড়ে মেলার ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি জানা গেল। ধন্যবাদ। মেলাটি মাঘীপূর্ণিমায় শুরু হয়ে দোলপূর্ণিমায় শেষ হয়। অর্থাৎ গঙ্গাস্নান থেকে শুরু হয়ে রাধাকৃষ্ণকে দোল দিয়ে শেষ হয়। ডোক নদীর উত্তরবাহিনী অংশের জন্য স্থাপিত হয়েছিল গঙ্গা মন্দির। গঙ্গা থাকলে শিবও থাকবেন। মেলার শেষদিন অর্থাৎ দোলপূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হত বা এখনও হয় দোল উৎসব। দোলের জন্য পরিচিত স্থানের নাম হয় দোলুয়া বা দলুয়া আর মেলার নাম হয় দলুয়ামেলা।

**রাজকুমার জাজোদিয়া**
**কালিয়াগঞ্জ।**

### সুস্থ থাকুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'সুস্থ থাকুন' বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভেজাল খাদ্য আর দূষিত পরিবেশে মানুষ পুরো সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে পারে না। সুস্থ থাকুন-এ, শরীর স্বাস্থ্য কীভাবে চললে, কীভাবে কী খেলে ভালো থাকবে তার তথ্য থাকে। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি এই পাতা থেকে। এই ফিচার সত্যিই প্রয়োজনীয়।

**শিপ্রা শিকদার**
**মোহন্তপাড়া এক্সটেনশন, জলপাইগুড়ি।**

### শিলিগুড়ির জনপ্রিয় ভুটিয়া মার্কেটের ঐতিহ্য বিলীন হওয়ার মুখে

ফি বছরের অতিথি তাঁরা। তাঁদের আগমনের অপেক্ষা করেন শহরবাসী। তাঁদের দাপটে মুখর হয়ে ওঠে এই শহরের একটুকরো জমি। আসলে তাঁদের বয়ে আনা পণ্যের প্রতি টান প্রথম থেকেই ছিল।

সম্প্রতি সমাপ্ত হল শিলিগুড়ি শহরের হাকিমপাড়ায় ভুটিয়া মার্কেট পর্ব। এই ভুটিয়া মার্কেট শহরবাসীর কাছে তো বটেই, পার্শ্ববর্তী জেলা এবং রাজ্যেও রয়েছে এর পরিচিতি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই মার্কেটের ঐতিহ্য ও কৌলিন্য আজ ক্রমশই হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে, এহেন দুরবস্থার কারণ কী ?

এই শহরের বিখ্যাত ভুটিয়া মার্কেটে একসময় কেবল ভুটিয়ারাই আসতেন, তাঁদের হাতেবোনা শীতবস্ত্রের পসরা নিয়ে। দামের দিক থেকে কম তো ছিলই, শীতবস্ত্রের মুখ্য গুণ যে উষ্ণতা, তা নিয়ে সকলেই তৃপ্ত ছিল। সেদিন নিছক দেখার টানে ভুটিয়া মার্কেটে হাজির হয়ে নিরাশ হলাম। ভুটিয়া মার্কেটের অর্ধেকের বেশি দখল করে নিয়েছেন রেডিমেড শীতের পোশাক নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। আবার ভুটিয়াদের দোকানেও রেডিমেড কিছু পোশাক দেখে অবাক হলাম। প্রশ্ন করতেই এক ভুটিয়া দোকানির সখেদ উক্তি-স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমরাও কিছু 'রেডিমেড' পোশাক রাখতে বাধ্য হচ্ছি। তাঁদের আরও বক্তব্য, প্রতিবছরই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের অনেকেই এখানে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। আসলে এখানে আমাদের যাঁরা বসার অনুমতি দেন তাঁরাই এখন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য দিচ্ছেন। ঘটনা হল, ভুটিয়া মার্কেটে এখন লোকজন আসেন নামের টানেই। তাহলে কি জনপ্রিয় এই মার্কেটের ঐতিহ্য বিলীন হওয়ার মুখে ? উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেবে আশা করি।

**চন্দন নাগ**
**সেবক রোড, চেকপোস্ট, শিলিগুড়ি।**

### বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যন্ত্রণাকাতর জীবনের কথা

যৌথ পরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতেন। ওঁরা অসুস্থ হলে ঘরের সবাই পালা করে সেবা করতেন। আর এখন ? যে পিতামাতার তিলতিল করে গড়া সংসার, সেই সংসারে তাঁদেরই ঠাঁই হচ্ছে না। খুঁজলে কটা ঘর পাবেন যেখানে পুত্র, পুত্রবধূদের সঙ্গে ওঁরা সম্মানের সঙ্গে বেঁচে আছেন ?

এই তো রাজকোটে অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে তাঁর ছেলে টেনেহিঁচড়ে চারতলা থেকে ধাক্কা দিয়ে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল, যে মা তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন। মেয়েরাই বা কম কীসে ! মাকে মারধর করে তালাবন্দি করে রেখে দেওয়ার খবর পড়ি। কোথাও শোনা যায় বর্ষায় মায়ের ঘরের টিনের চাল ফুটো করে রাখা হয়েছে। কোথাও শীতের রাতে মায়ের বিছানায় জল ঢেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। কেউ চিকিৎসার নাম করে অচেনা জায়গায় বাবা, মাকে ছেড়ে দিয়ে আসে। কোথাও বাবার পেনশন আত্মসাৎ করেও মাকে দিয়ে সংসারের সব কাজ করিয়ে নেয়। কাজের মাসির সঙ্গে অন্যায় হলে খোসামোদি করে মিটিয়ে নেয়। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের একটু এদিক-ওদিক হলে অকথ্য বাক্যবাণে জর্জরিত করে। কোথাও উফ্ করার উপায় নেই। সমাজ পরিজনও বলবে, একটু মানিয়ে নাও। এই বয়সে যাবেটাই বা কোথায় ? কেউ কেউ নাতি-নাতনির কথা ভেবে, কেউ আবার পুত্রের সম্মানের কথা ভেবে কষ্ট করে মানিয়ে নেয়। এসব খবর পড়ি। কে বলুন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভেতরের যন্ত্রণাটাকে হাতড়ে দেখবে ? একথা তো সত্যি, এটাই যদি পরম্পরা হয় তাহলে এই মা-বাবার মতো একরাশ যন্ত্রণা বুকে বয়ে সবাইকে বলতে হবে- ভালো আছি। তাই আজকের প্রজন্ম সাবধান হয়ে যাও, ভবিষ্যতে যেন এই কষ্টটা তোমাদের বহন করতে না হয়।

**রেবা দাসসাহা**
**সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি।**

### রাস্তার ধারের পিঠে বাজার

ইদানীং দিনহাটার বিভিন্ন রাস্তার ধারে পরিপূর্ণ আয়োজন সহ অনেক ভাপা পিঠের দোকান দেখা যাচ্ছে। বড়ো একটা পাত্রে বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত চালের গুঁড়ো এবং পিঠে ভাজার পাত্র ও উনুন সাজানো রয়েছে। একেবারে হাতে গরম পিঠের ব্যবস্থা। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কিছু তৈরি পিঠে একেবারে রেডি-টু-সার্ভ সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। সবই রয়েছে একেবারে খোলা উন্মুক্ত অবস্থায়। রাস্তায় চলমান ছোটোবড়ো সব গাড়ির চাকার ধুলো ওই তৈরি পিঠে এবং উপকরণগুলির উপর গিয়ে পড়ছে। রাস্তার আশেপাশে দাঁড়ানো বিভিন্ন গাড়ির গায়ে জমা ধুলোর আস্তরণই ধুলোর পরিমাণের জলজ্যান্ত সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ছোটোদের সঙ্গে বড়োরাও নির্দ্বিধায় ভাপা পিঠে কিনে খাচ্ছে। পিঠের দোকানের সামনে এবং আশেপাশে প্রচুর পানের পিক, কফ, কাশ, থুথুর ছড়াছড়ি। পিঠের দোকানদার নিজেও পানের পিক এবং চর্বিত খইনি নিক্ষেপ করছে। ট্রেনের যাত্রাপথে রানিনগর জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও খোলা অবস্থায় ভাপা পিঠে এবং তেলেভাজার বেসাতি সাজিয়ে রেখে বিক্রি করা হচ্ছে দেখেছি। ট্রেন ঢোকামাত্র ধুলোর ঝড় ওই পিঠে এবং তেলেভাজার উপরে আছড়ে পড়ছে। অনেক সময় ওই তেলেভাজায় বেসনের পরিবর্তে হলুদ মেশানো আটা বা ময়দা ব্যবহার করা হয়েছে বলে বাদানুবাদও চলছে। কিন্তু নানা প্রকার রোগব্যাধি সংক্রমণের এই ভয়ংকর কাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এই বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**অমল মজুমদার**
**মদনমোহনপাড়া, দিনহাটা।**

### সমাজের বন্ধু

পুলিশ সমাজের বন্ধু। সীমান্তে বীর সৈনিক জীবন দিয়ে দেশকে সুরক্ষিত রাখে। পুলিশ সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রেখে দিনরাত মানুষের সেবা করে। পুজোপার্বণ, অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তারা আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে একত্রে উপভোগ করতে পারে না। কারণ শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাদের উপর। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই অস্থিরতায় কাটে তাদের জীবন। বর্তমান সময়ে অপরাধ বেড়েই চলেছে। নারী পাচার, মাদক পাচার, ধর্ষণ, দুর্ঘটনা, চুরি, ডাকাতি বিভিন্ন অসামাজিক কাজ চলছে। সেসব রুখতে পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করেই চলেছে। তাদের এই অবদান আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

**রমেশচন্দ্র মজুমদার**
**নেতাজি মোড়, এনজেপি।**

এ বিভাগে ছবি সহ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি- এই ঠিকানায়।

### অবহেলিত ইসলামপুর কবে জেলার মর্যাদা পাবে ?

উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে থাকা মহকুমাগুলির মধ্যে ইসলামপুর অন্যতম। এই মহকুমার স্থাপনা হয়েছে ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে। তাঁর খুবই বাসনা ছিল, এই মহকুমা দ্রুত উন্নতি করে জেলায় পরিণত হবে। কিন্তু প্রায় ৬০ বছর অতিক্রম করার পরও ইসলামপুর মহকুমা জেলার গুরুত্ব পায়নি।

এই মহকুমার অধীনে আছে পাঁচটি বিধানসভা, পাঁচটি ব্লক, ঊনষাটটি গ্রাম পঞ্চায়েত, দুটি পুরসভা। উত্তরে সোনাপুর থেকে দক্ষিণে ডালখোলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এই মহকুমার অধীনে। এর জনসংখ্যাও কম নয়। তবুও কেন ইসলামপুর অবহেলিত ? ইসলামপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভালো। জাতীয় সড়ক, রেল এই শহরের বুক চিড়ে চলেছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরও খুব কাছে। এত ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এই মহকুমার উন্নতি হতাশাব্যাঞ্জক।

এই মহকুমার রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ, তিস্তা ক্যানেলের পরিসেবা না পাওয়াতে উন্নতমানের কৃষিজমি থাকা সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নত। শিক্ষায়ও এ অঞ্চল পিছিয়ে। রয়েছে চিকিৎসকের অভাব। যথোপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিসেবা তাই পাওয়া যায় না। ফলে রোগী নিয়ে পরিবারের লোকজন সমস্যায় পড়ে। এই মহকুমার আর একটি সমস্যা হল জেলা মুখ্যালয়ের দূরত্ব। সোনাপুর থেকে রায়গঞ্জের দূরত্ব প্রায় ১৬০ কিমি, ইসলামপুর শহর থেকে প্রায় ১২০ কিমি। এই দূরত্ব অতিক্রম করে জেলা মুখ্যালয়ে কোনো কাজের জন্য যেতে হলে সকলকে দশবার ভাবতে হয়। তারপরেও যেদিন গেলাম সেইদিন কাজ হবে কিনা, কাজ হলেও সেদিন বাড়িতে ফিরে আসা যাবে কিনা, যাতায়াতে প্রচুর টাকা লাগবে ইত্যাদি সমস্যা ভাবায়। বিকেলের পর রায়গঞ্জ থেকে ইসলামপুরে ফিরে আসার জন্য তেমন যানবাহনও পাওয়া মুশকিল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিগত দুই বছরে উত্তরবঙ্গে মাত্র দুটি নতুন জেলা হয়েছে। অথচ বলা হয় রাজ্যে যত বেশি জেলা হবে ততই উন্নতি। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদান জেলার সংখ্যার নিরিখে দেওয়া হয়। এতে তো রাজ্যেরই লাভবান হওয়ার কথা। তাই অবিলম্বে ইসলামপুরকে জেলা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

**শঙ্করচন্দ্র ভাওয়াল**
**স্কুলপাড়া, চোপড়াঝাড়, ইসলামপুর।**

### জাতীয় সড়কে টোটো

দুর্ঘটনা ঘটার পরে হাহুতাশ করে লাভ নেই, বরং আগেই সতর্ক হওয়া ভালো। বর্তমানে রায়গঞ্জে জাতীয় সড়কে টোটোর চলাচল বাড়ছে। যখন তখন দুর্ঘটনার আশঙ্কা। তাই উত্তর দিনাজপুরের মাননীয় এসপির কাছে আবেদন, আপনি অবিলম্বে উদ্যোগী হয়ে জাতীয় সড়কে টোটো নিষিদ্ধ করুন। এজন্য জাতীয় সড়কে নিয়মিত পুলিশের নজরদারি থাকা প্রয়োজন।

**সামিম আখতার বানু**
**সোনাবাড়ি, মিরুয়াল, রায়গঞ্জ।**